ছোটদের আওরঙ্গজেব

শহীদুর রহমান

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটদের আওরঙ্গজেব

শহীদুর রহমান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটদের আওরঙ্গজেব
শহীদুর রহমান
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩৬
ইফাবা প্রকাশনা : ২৮০/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২৩.১৫৪
ISBN : 984—06—0318—3

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮০

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৫
জ্যৈষ্ঠ ১৪১২
রবিউস সানী ১৪২৬

মহাপরিচালক
এ জেড এম শামসুল আরম

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
রফিকুল ইসলাম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৮.০০ টাকা মাত্র

CHOTODER AURANGAJEB (Life-sketch of Aurangajeb for Children): Written by Shahidur Rahman in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 August 2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 18· 00 ; US Dollar : 1·00

facebook/@maktabatuttalamij

মহাপরিচালকের কথা

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদের মধ্যে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব অন্যতম। তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও জীবনযাপন করতেন অত্যন্ত সরল ও সাধারণভাবে। আল্লাহ্র ওপর পরম বিশ্বাস, ভয় ও ভীতি, মানুষের সঙ্গে বিনয়াবনত মার্জিত আচরণ এবং সহজ-সারল্য ছিল তাঁর অনন্যসাধারণ গুণ। প্রজাদের মঙ্গল সাধনই ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। স্বীয় প্রয়োজন সংকুলানে রাজকোষ থেকে তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করেননি। টুপি সেলাই ও কুরআন শরীফ নকল করে যা অর্জিত হ'তো তাই দিয়ে তাঁর সংসার নির্বাহ করতেন। এজন্যে তিনি পরিচিহ্নিত হয়েছিলেন 'ফকীর বাদশাহ্' রূপে।

সুলেখক শহীদুর রহমান এই মহান বাদশাহ্র জীবন-কাহিনী অবলম্বনে ছোটদের উপযোগী করে 'ছোটদের আওরঙ্গজেব' শিরোনামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করে ছোট-বড় সবাই উপকৃত হবে। গ্রন্থখানি তৃতীয়বারের মতো প্রকাশের সুযোগ লাভ ক'রে সত্যিই আমরা আনন্দিত।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

ধর্মে কর্মে, এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এবং ন্যায়-নীতিতে বিশ্বাসী রাজা-বাদশাহ্ যতই ক্ষমতাধর হন না কেন তিনি কখনো কোন অন্যায় কাজ করতে পারেন না। মহান আল্লাহ্‌র ভয় ও ভালবাসা তাঁকে সর্বত্র সৎ পথে পরিচালিত করে। সে রকম একজন মহান সম্রাট ছিলেন বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব। তিনি বিশাল ভারতের অধিপতি হলেও চলতেন একজন সাধারণ মানুষের মতো। রাজকোষকে তিনি মনে করতেন প্রজাদের সম্পদ। সে সম্পদে হাত দেওয়ার তাঁর কোন অধিকার নেই। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ নকল করে ও টুপি সেলাই করে যা উপার্জন করতেন তাই দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন। এজন্যে তাঁকে বলা হতো 'ফকীর বাদশাহ'।

বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে তাঁর মতো মহান প্রশাসক বড় প্রয়োজন। সুতরাং এ ধরনের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনী যতো বেশি আলোচিত হবে ততো বেশি প্রভাব বিস্তার করবে আমাদের সমাজে।

বিশিষ্ট লেখক শহীদুর রহমান ছোটদের উপযোগী করে এই মহান সম্রাটের জীবনী অবলম্বনে গল্পাকারে লিখেছেন 'ছোটদের আওরঙ্গজেব' শীর্ষক এই বইটি। বইটি ইতমধ্যে আমাদের শিশু-কিশোরদের মাঝে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

'হযরত হাসানের পবিত্র মাযার যেন আমার তরফ থেকে এক টুকরো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এ জন্য প্রয়োজনীয় টাকা রাখা আছে আমার পুত্র শাহ্জাদা আযমের কাছে। টুপি সেলাই করে আমার উপার্জিত চার টাকা দু'আনা রয়েছে আয়া বেগার কাছে। সে টাকাটা আমার কাফনের জন্য ব্যয় করবে। কুরআন শরীফ নকল করে মজুরি বাবদ যে তিন শ' পাঁচ টাকা আমি পেয়েছি, তা যাবে আমার নিজস্ব তহবিলে। আমার মৃত্যুর দিনে সে টাকা গরীবদের ভেতর বিলিয়ে দেবে। আমার মাথা অনাবৃত রেখে আমাকে কবর দিও, আমি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র করুণা দেখতে পাই। আমার মৃতদেহ সবচেয়ে কাছের গোরস্থানে বয়ে নিয়ে যাবে। অনাবশ্যক কফিনে না রেখে কবরের মাটিতে শুইয়ে দেবে আমাকে।'

কথাগুলো শুনে অনেকেই হেঁয়ালির মত মনে করবে। ভাববে এসব আবার কিসের আবদার। অথচ আমার কাছে তা মোটেই হেঁয়ালি নয়। কারণ, যিনি এ কথাগুলো বলেছেন, তিনি তো সাধারণ মানুষ নন। তিনি ছিলেন তাঁর বংশের সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ, উদার এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, অথচ তাঁকেই ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠুর, খুনী, জঙ্গী, অত্যাচারী, হিন্দু-বিদ্বেষী, গোঁড়া ইত্যাদি বলে কলুষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনিই তো প্রজাসাধারণের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে শেষ

facebook/@maktabatuttalamij

জীবনে টুপি সেলাই করে ও কুরআন নকল করে সংসার চালিয়েছিলেন। আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে ঐ উইল করে গিয়েছিলেন। সে উইল কিন্তু আর দশটা সাধারণ উইলের মত নয়। উইলের প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠেছে উইলকারীর বিশ্বাস আর চরিত্র। আর সে উইলকারী ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব।

বংশ পরিচয়

আওরঙ্গজেব তৈমূর বংশের লোক। এ বংশের আদি পুরুষ আমীর তৈমূর। তিনি আসলে তুর্কবীর ছিলেন। তাঁর বংশেরই সন্তান ভারত সম্রাট আকবর। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের যোগ্য সন্তান সম্রাট শাহজাহান। আর শাহজাহানের সুযোগ্য বীর সন্তান হলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব।

আওরঙ্গজেব সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। তাঁর চার পুত্রই মমতাজ মহলের কোলে বড় হয়েছে। মমতাজ মহলের অন্য নাম আরজুমান্দ বানু বেগম। আরজুমান্দ বানু বেগম ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আসফ খান। তিনি পরে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আপন মেয়ের সাথে সম্রাট শাহজাহানের বিয়ে দেন। কিন্তু তার আগে মেয়েকে তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর কালে তিনি একজন প্রতিভাময়ী মহিলা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়েই সম্রাট শাহজাহান তার নাম দিয়েছিলেন 'মমতাজ' অর্থাৎ 'আমার মাথার মুকুট'। সে নাম অনু-সারেই আগ্রার বিশ্ববিখ্যাত 'তাজমহল'-এর নামকরণ করা হয়েছে।

মমতাজ মহল অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের মহিলা ছিলেন। গরীব-দুঃখীদের ব্যথায় তাঁর অন্তর সবসময় কাঁদতো। গরীব-দুঃখী, ইয়াতিম ও বিধবারা তাঁর কাছে কিছু চেয়ে কখনো খালি হাতে ফিরে যায়নি। এমনকি তিনি ইয়াতিম বালিকাদের বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিতেন। অধিকন্তু তিনি একজন ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে নামায আদায়

facebook/@maktabatuttalamij

করতেন এবং রোযাসহ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিতভাবে পালন করতেন। মনে হয় মায়ের এ গুণগুলোই আরওঙ্গজেবের উপর প্রভাব ফেলেছিলো বেশি।

জন্ম

আওরঙ্গজেব ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর দোহাদে জন্মগ্রহণ করেন। দোহাদ হলো মালাবা সীমান্তের কাছাকাছি এবং বরোদা উজ্জয়িনীর ঠিক মাঝামাঝি স্থান। তবে আরওঙ্গজেবের জন্মের তারিখটি নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন—দোহাদেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু জন্মের তারিখটা হবে ২৪শে নভেম্বর। সে যাই হোক, সম্রাট শাহজাহান তখন ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। তিনি ও তাঁর বেগম মমতাজ মহল সে সময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাঁচ মহল তালুকে বাস করছিলেন।

শৈশবকাল

আওরঙ্গজেবের শৈশবকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। কারণ, তাঁর জন্মের পর পরই পিতা শাহজাহানের জীবনে ঝড় বইতে শুরু করলো। আর সে ঝড় সৃষ্টি করেন শাহজাহানের বিমাতা নূরজাহান। নূরজাহানের পরামর্শেই তখন রাজ্যের সবকিছু চলতে শুরু করেছিলো। কিন্তু সেখানে পথের কাঁটা হলেন শাহজাহান। কারণ, ইতিমধ্যে শাহজাহান পিতার মন জয় করে ফেলেছেন। আর পিতা তাঁকেই সিংহাসনে বসানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নূরজাহান চান শাহরিয়ারকে সেখানে বসাতে। কাজেই নূরজাহান এবং শাহজাহানের মধ্যে দেখা দিল দ্বন্দ্ব। তিনি শাহজাহানকে মোটেই ভালো চোখে দেখতেন না। কাজেই শাহজাহানকে বিমাতার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পালিয়ে যেতে হলো এক সময়।

facebook/@maktabatuttalamij

পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধও করতে হলো তেলিঙ্গানা ও বাংলাদেশে। এভাবেই তিনি তিন-চার বছর ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর আবার ফিরে এসে দাক্ষিণাত্যের পূর্বপদ দখল করলেন। এতে পিতাও তাঁকে ভুল বুঝলেন। কিন্তু শাহজাহান সে ভুল ভাঙ্গতে পেরেছিলেন শেষে। তবে পিতার অনুগ্রহ পেতে তাঁকে পোড়াতে হয়েছে অনেক কাঠখড়ি। শেষ নাগাদ আত্মসমর্পণ করে পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন স্বেচ্ছায়। কিন্তু তার বিনিময়ে জামিন স্বরূপ পাঠালেন তাঁর দুই পুত্র দারাশিকোহ এবং আওরঙ্গজেবকে। সে সময় আওরঙ্গজেবের বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। এ সময় দাদীর স্নেহ ছিল বিষমাখা। কারণ, দাদী তো শাহজাহানকে বিষ-নজরে দেখতেন। সেজন্যই শাহজাহানের পুত্রকেও বিষের স্নেহে দিলেন বিষিয়ে। কাজেই আওরঙ্গজেবের শিশুকালও থাকলো আঁধারে ঢেকে।

শিক্ষা জীবন

এমনি করে আরো দু'বছর কেটে গেলো। শাহজাহান হলেন ভারত সম্রাট। তাই আওরঙ্গজেবের জীবনেও এলো বিরাট পরিবর্তন। তখন তাঁর বয়স ন'বছর। এ বয়সেই তাঁর শিক্ষা-জীবন শুরু। এ সময়েই তিনি আরবী-ফার্সী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর ধী শক্তি ছিলো অন্য ভাইদের চেয়ে বেশ ধারালো। আর তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের সহযোগিতায় অল্প সময়েই আরবী-ফার্সী সাহিত্যেও লাভ করেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য। একথা তাঁর হাতের লেখা চিঠিপত্র থেকেই বোঝা যায়। এ ছাড়া তিনি ইসলামী শরীয়ত ও ফিকাহ্ শাস্ত্রেও হয়ে উঠলেন সুপণ্ডিত। পরিণত বয়সে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফতোয়া-ই আলমগিরি' নামে বিখ্যাত আইনের বই লিখিত হয়। এ বইখানা মুসলমান সমাজে এখনো প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

ছোট বেলাতেই আওরঙ্গজেব কুরআনে হাফেজ হন। গোটা কুরআন শরীফ তাঁর মুখস্থ ছিলো। তাঁর হাতের লেখাও ছিলো ছাপার অক্ষরের

facebook/@maktabatuttalamij

মত সুন্দর। তাই অনেকে প্রশংসা করে বলতেন, আওরঙ্গজেবের লেখা মুক্তোর মত ঝকঝকে। তিনি আবার মনের মত করে নস্তালিক এবং শিকস্ত লিপিও লিখতে পারতেন। আর বড় হয়ে তিনি যে কুরআন নকল করতেন তাও ছিলো সুন্দরতম। সেগুলোই তিনি মক্কা, মদীনা ইত্যাদি বিখ্যাত মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে পাঠাতেন। আবার ছোট ছোট ফার্সী কবিতাও লিখতে পারতেন তিনি। আর বাল্যকাল থেকেই কুরআন এবং হাদীসের উপদেশ অনুসারে নিজের চরিত্র গড়তে শুরু করেন। তখন থেকেই তিনি বিনয়ী শাহজাদা হিসাবেও পরিচিত হন। এ গুণ তিনি লাভ করেন রসূল (সা)-এর এক হাদীস থেকে। রসূল (সা) বলেন ঃ 'যে বিনয়ী সে-ই আল্লাহ্‌র কাছে মহা সম্মানী।' কিন্তু আওরঙ্গজেবের অন্য ভাইয়েরা এ গুণ অর্জন করেন নি।

যৌবনকাল ও কর্মজীবন

এতক্ষণ আমরা আওরঙ্গজেবের শৈশবকালের কথা বললাম। তিনি তো শৈশবকালে কেবল নৈতিক শিক্ষাই পেয়েছিলেন। অথচ শাহজাদা হিসাবে কেবল নৈতিক শিক্ষা লাভ করলে চলে না। তাঁর চাই যুদ্ধ শিক্ষা, চাই রাজ্য পরিচালনার শিক্ষা। তাই ১৬ বছর বয়স থেকেই শুরু হলো যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা। তিনি ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ভর্তি হলেন সেনানায়ক হিসেবে। সেনানায়ক হিসেবে তিনি প্রথমেই বুন্দেলার সরদার ঝুকার সিংহ এবং তার পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। সে যুদ্ধে জয়ীও হলেন তিনি। আর পিতা শাহজাহান দেখলেন আওরঙ্গজেব পিতার উপযুক্ত ছেলেই হয়েছে। তাই তিনি তাঁকে ভাইসরয় বা রাজ-প্রতিনিধি করে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার দিলেন। এই দাক্ষিণাত্যই ছিল আওরঙ্গজেবের জন্মস্থান। এই জন্মস্থান থেকেই শুরু হলো তাঁর কঠিন কর্মজীবন। আর এই কর্মজীবনকে সম্বল করে ইসলামের শত্রুরা

facebook/@maktabatuttalamij

তাঁর বিরুদ্ধে কত কুৎসাই না রটিয়ে দিলো। তারা বললো—আওরঙ্গজেব আপন ভাইকে খুন করেছে, আপন পিতাকেও বন্দী করে সিংহাসন দখল করেছে। এমনকি ধর্মের গোঁড়ামি করে রাজ্যটা পর্যন্ত ছারখার করে দিয়েছে। সে হিন্দুদেরকে দেখতে পারতো না। তাই গির্জা মন্দির পর্যন্ত তাঁর সহ্য হত না। এমনি ধরনের আরো কত বানোয়াট কথাবার্তা। কিন্তু আওরঙ্গজেব কি তেমন মানুষ ছিলেন? আসলে তেমন মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহান, উদার এবং একজন খাঁটি আল্লাহ্‌ভক্ত মানুষ।

আওরঙ্গজেবের চেয়েও বেশি আল্লাহ্‌ভক্ত মানুষ ছিলেন খলীফা হযরত উমর (রা)। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা তাঁকেও খারাপ বলতে ছাড়েনি। তারা তাঁর দুর্নাম রটিয়ে বলেছিলো, হযরত উমর (রা) আলেকজান্দ্রিয়ার বিরাট লাইব্রেরী ধ্বংস করেছে। এমনকি এই সব কথা তারা সভাসমিতি, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমেও সত্য বলে প্রচার করেছিলো। অথচ হযরত উমর (রা) কত বড় মহামানব ছিলেন। রসূলে খোদা (সা) তাঁর সম্বন্ধেই বলেছিলেন—আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে সে হযরত উমরই হতো। তাহলে বোঝা যায়, ইসলামের শত্রুদের সে কাজ ছিলো উদ্দেশ্যমূলক। তারা ইচ্ছে করেই মুসলমানদেরকে ছোট করতে চায়। তাই আওরঙ্গজেবকেও ছাড়লো না। কিন্তু আমরা প্রকৃত ইতিহাস ঘেঁটে দেখবো আওরঙ্গজেব সত্যি সত্যি অমন খারাপ মানুষ ছিলেন কিনা।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

সেদিন ছিলো ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর। শাহজাহান কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তিনি কিছুদিন দরবারে আসা–যাওয়া বন্ধ করে দেন। ইতিমধ্যে একটি সাংঘাতিক খবর রটে গেল। রাজ্যময় ছড়িয়ে গেল সম্রাট শাহজাহান ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু শাহজাহান সত্যি সত্যি

facebook/@maktabatuttalamij

তখনও বেঁচে ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। আর দুর্বলতার কারণে বাইরে যেতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনিও শুনলেন তাঁর মৃত্যুর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অতএব, তিনি একদিন ঝরোকায় দেখা দিলেন। ঝরোকা হলো জনসাধারণের সাথে সম্রাট শাহজাহানের দর্শন দেবার স্থান। সেখানে দেখা দিয়ে তিনি মিথ্যা গুজব বন্ধ করতে চাইলেন। তবে তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই তিনি সাথে সাথে সব অফিসারদের উপর আদেশ জারি করলেন। বললেন, 'তোমরা সবাই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর আদেশ মত চলবে। সে-ই হল এখন থেকে ভাবী সম্রাট। আর দারাশিকোকেও তিনি সম্রাট হিসাবে চলার আদেশ দেন। দারাও সম্রাটের পক্ষে রাজ্য চালনা করতে শুরু করেন। তিনিই তখন রাজ্যের সর্বময় কর্তা। কিন্তু তিনি এ খবর বাইরে যেতে ছিলেন না একটুও। বরং উযিরদেরকে ডেকে এনে শপথ করালেন। বললেন, 'খবরদার, এসব খবর যেন কিছুতেই বাইরে না যায়।' এজন্য তিনি বাংলাদেশ, আহমদাবাদ এবং দাক্ষিণাত্যে সংবাদ-বাহকদের যাওয়া-আসা বন্ধ করে দেন। অধিকন্তু আওরঙ্গজেবের দূত ইসা বেগকে বন্দী করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। কারণ, তাঁর মাধ্যমে অন্য ভাইয়েরা খবর পেতে পারে। তারাও সিংহাসন দখলের জন্য আসতে পারে।

কিন্তু এতে হিতে হলো বিপরীত। নানাজন নানা কথা কানাঘুষা করতে লাগলো। বলতে লাগলো, শাহজাহানের মৃত্যু হয়েছে। আর সেই সুযোগে তাঁর ছেলেরা সিংহাসন দখলের জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখানেই হলো মজার ব্যাপার। কারণ, মোগল সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকারের কোন আইন ছিলো না। কে আগে সম্রাট হবে তারও কোন নিয়ম ছিলো না। সে যেন এক নাবালক ইয়াতীমের সম্পত্তি। যে ইচ্ছা সেই দখল করতে চায়। অতএব, সম্রাটের চার পুত্রই নামলেন প্রতিযোগিতায়। তরবারির সাহায্যে করতে চাইলেন মীমাংসা। আর সাথে সাথে শুরু হলো ষড়যন্ত্রের পর

facebook/@maktabatuttalamij

ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রে রাজ্যময় শুরু হলো ভীষণ বিশৃঙ্খলা। এ বিশৃঙ্খলায় তোলপাড় উঠে গেল। হালভাঙ্গা নৌকার মত রাজ্য পড়লো সমুদ্রের ঝড়ে।

মুরাদ এবং সুজার বিদ্রোহ

এ সুযোগেই গুজরাটের অধিপতি মুরাদ আর বাংলার শাসনকর্তা সুজা স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে দিলেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা বললেন, 'আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমরা আর মোগল সম্রাটের অধীন নই।' শুধু তাই নয়, তাঁরা আবার নিজেদের নামে মুদ্রাও চালু করে দিলেন। এমনকি নিজ নিজ নামে জুম'আর নামাযে খুৎবা পাঠেরও আদেশ দিলেন। অধিকন্তু মুরাদ প্রায় ছয় হাজার সৈন্যসহ সুরাট বন্দর আক্রমণ করেন। কেবল আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আওরঙ্গজেবের দূত আলী নকীবকেও নিজের হাতে হত্যা করেন।

কিন্তু আওরঙ্গজেব অত অস্থির হন নি। তিনি ধীর বুদ্ধিতে অগ্রসর হলেন। ভাবলেন, 'রাজ্যের এত সব এলোমেলো হয়ে গেল। কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, এসব একটু বিবেচনা করা দরকার। তাছাড়া, সম্রাট বেঁচে আছেন কি না কে জানে। এসব বিষয়ে একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। আর হুজুগে কিছু করা অন্যায়ের শামিল। তাই তিনি ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি পরীক্ষা করতে লাগলেন। আর এদিকে মুরাদকে করলেন তিরস্কার। কারণ তখনো পিতা শাহজাহানের মৃত্যুর সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়নি। কিন্তু মুরাদ অত বিবেকবান ছিলেন না। তিনি ছিলেন মোটা বুদ্ধির মানুষ। তাই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাথে সাথে আওরঙ্গজেবকে লিখলেন, অতসব চিন্তা-ভাবনার সময় নেই। তুমি তাড়াতাড়ি আস। না হলে ভীষণ বিপদ হতে পারে। এ কথা জেনে অগত্যা আওরঙ্গজেব আর কি করেন। তিনি মুরাদের সাথে একমত হলেন আর দুভাই সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এখানেই অনেকে মনে করেন, আওরঙ্গজেবের মত ক্ষমতালোভী আর কে হতে পারে। সে তো তাঁর পিতার সাম্রাজ্য পর্যন্ত

facebook/@maktabatuttalamij

মুরাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে আক্রমণ করে। অথচ প্রকৃত ঘটনায় আমরা দেখলাম যে, মুরাদ তাঁকে এ কাজে অগ্রসর হতে প্রভাবিত করেছেন। আসলে সাম্রাজ্য আক্রমণের লোভ আওরঙ্গজেবের ছিল না।

সে যাই হোক, চুক্তিতে যখন আওরঙ্গজেব আবদ্ধ হয়েছেন তখন আর কি করবেন। অগত্যা মুরাদের ডাকে রাজধানী আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন। আর উজ্জয়িনীর কাছে দিপালপুর নামক স্থানে এসে মুরাদের সাথে মিলিত হলেন। উভয়ের মিলিত বাহিনী ধরমত নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলো। আর শত্রুর মুকাবিলার অপেক্ষা করতে থাকলো।

দারা ও সুজার রণসজ্জা

এ দিকে দারা ও সুজার রণসজ্জা চলছে। সুজা তাঁর বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তিনিও পিতার সিংহাসন দখল করবেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তিনি বারানসী এসে পৌঁছেন। অপরদিকে দারাও বসে থাকার মত মানুষ নন। তাঁর তো সিংহাসন রক্ষা করতেই হবে। অতএব, সুজাকে শায়েস্তা করার জন্য দারা তাঁর পুত্র সোলায়মান শিকোহ এবং জয়সিংহকে পাঠালেন। তাঁরা বাহাদুরপুর নামক স্থানে সুজার সাথে তুমুল যুদ্ধ করলেন। এ যুদ্ধে সুজা পরাজিত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যান।

কিন্তু দারা এতেই দমলেন না। তাঁকে সিংহাসনে বসতে হলে তো কাঁটামুক্ত হতে হবে। আর তাঁর কাঁটা হলো আওরঙ্গজেব এবং মুরাদ। অতএব, দারা তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নিলেন। তিনি ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল মহারাজা যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খানের নেতৃত্বে এক বিশাল রাজপুত বাহিনী পাঠালেন। আর এ বাহিনীই সেই ধরমত নামক স্থানে এসে আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এখানেই যশোবন্ত সিংহ ও তাঁর রাজপুত বাহিনী আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আর যশোবন্ত

facebook/@maktabatuttalamij

সিংহ পালিয়ে ফিরে গেলেন সেই মাড়ওয়ারে তাঁর রাণীর কাছে। এখানেই ঘটলো আর এক মজার ব্যাপার।

রাজপুত রাণীরা কিন্তু সাংঘাতিক। তাঁরা স্বামীর কোনো অপমান সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া স্বামী যুদ্ধে হেরে পালিয়ে গেলে তো আরো ভীষণ ব্যাপার। স্বামীকে হয় যুদ্ধে বীরের মত প্রাণ দিতে হবে না হয় যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। কিন্তু যশোবন্ত সিংহের কপালে তার কোনোটাই হলো না। অতএব, রাণী গেলেন ক্ষেপে। তিনি দুর্গের তোরণদ্বার দিলেন বন্ধ করে।

একদিকে যশোবন্ত সিংহের তো এই করুণ অবস্থা। আর অপরদিকে এ সংবাদ গেল দারার কানে। তিনি সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁর পুত্র সোলায়মান শিকোহকে বিহার থেকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু বিধি বাম হলে কি আর হয়? সুলায়মান শিকোহও করলেন দেরি। তাই নানা কারণে ধরমতের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবই জয়লাভ করেন। কিন্তু এতেই শেষ হলো না। এ যুদ্ধে জয়লাভের পর আরো মর্যাদার অধিকারী হলেন তিনি মশহুর হলেন সবখানে। আর যুদ্ধের অগণিত অস্ত্রশস্ত্র দখল করে গোয়ালিয়র চলে যান। তারপর চম্বল নদী পার হয়ে সামুগড়ে স্থাপন করেন শিবির।

দারা শিকোহর হতাশা

এদিকে দারা শিকোহ ধরমতের যুদ্ধের ফলাফলও শুনলেন। সে কথা শুনে তিনি দারুণভাবে হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তবুও তিনি দমে গেলেন না। বরং আওরঙ্গজেবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য চরম প্রস্তুতি নিলেন। এ প্রস্তুতিতে তিনি পঞ্চাশ হাজারের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সামুগড়ে পৌঁছেন। আর ১৬৫৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এবারেও তিনি রাজপুত বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে সামনে মোতায়েন করেন। অপরদিকে দারার কনিষ্ঠ পুত্র সিফির শিকোহকে বামে এবং ডান দিকে খলিলুল্লাহ খানকে যুদ্ধ পরিচালনার ভার দেন। আর

facebook/@maktabatuttalamij

দারা নিজে মাঝখানে একটি হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন।

তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকলো। চারদিক থেকে বর্শা বৃষ্টি শুরু হলো। গোলা বৃষ্টিও কম হলো না সেখানে। আর ঘোড়া হাতীর কথা তো বাদই দিলাম। তাদের চিৎকারে গোটা যুদ্ধ ময়দান যেন সেই কারবালার ময়দানে পরিণত হলো। আর তারই মধ্যে বামদিক থেকে সিফির শিকোহ এবং রুস্তম খান বীরবিক্রমে আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালালো। কিন্তু হঠাৎ শত্রুর একটি গোলা এসে রুস্তম খানের হাতীর মাথায় এসে লাগলো এবং হাতীটি মাটিতে পড়ে গেল। আর যায় কোথায়। অবশেষে রুস্তম খান পরাজিত হলো এবং সিফির শিকোহ পালিয়ে গেল। এবারে দারা পড়লেন বিষম ভাবনায়। এ অপমান সহ্য করেন কি করে!

অবশ্য সম্রাট শাহজাহান এ সময় পুত্রদের মধ্যে রক্তঝরার ঘোর বিরোধী ছিলেন। হাজারও হলেও কোন্ পিতা চোখের সামনে তাঁর পুত্রদের রেষারেষিতে রক্ত ঝরাতে চায়? তাই তিনি নিজেও দারাকে থামাতে চাইলেন। মীমাংসা করে দিতে চাইলেন উভয়ের মধ্যে। কিন্তু দারা এতই অহংকারী ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত পিতার কথায়ও কান দিলেন না। বরং বিশ হাজার সৈন্যসহ তিনি ভাতিজা মুহম্মদের বাহিনীকে আক্রমণ করেন। আবার রাজা রামসিংহ রাঠোর তাঁর বিরাট রাজপুত বাহিনী নিয়ে মুরাদকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মুরাদও তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি সাহস দিয়ে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন। অবশেষে রাজপুত বাহিনী পরাজিত হলো।

দারার পরাজয়

এদিকে এ সময়ই দারা করলেন একটি চরম ভুল। তিনি হাতীর হাওদা থেকে নেমে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে শুরু

facebook/@maktabatuttalamij

করলেন। কিন্তু সৈন্যরা হাতীর হাওদা খালি দেখে সাহস হারিয়ে ফেললো। তারা ভাবলো, তাদের সেনাপতি বোধ হয় যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। অতএব, যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলো। আর দারা এবং তাঁর পুত্র সিফির শিকোহ উভয়ে আগ্রার দিকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু যখন আগ্রায় পৌছলেন, তখন গভীর রাত। চারদিকে ঝিঁঝি ডাকছে। আর তারই মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি মেখে নিয়ে পিতা–পুত্র আশ্রয় নিলেন আগ্রায়। কিন্তু লজ্জায় শাহজাহানের সাথে দেখা পর্যন্ত করলেন না। কেবল তাই নয়, তিনি সম্রাটের সাথে দেখা না করেই দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। অথচ এর কিছু দিন আগে থেকেই শাহজাহান দিল্লী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাঁর মনের অশান্তি ও আগ্রার প্রখর রোদের তাপ এড়াতে চেয়েছিলেন ; এজন্য তিনি ১৬৫৮ সালের ২৯শে মে দিল্লী রওয়ানাও দিয়েছিলেন কিন্তু দারাই তাঁকে দিল্লী যেতে বাধা দিয়েছিলেন। আর শেষে তিনিই শাহজাহানকে ফেলে দিল্লী পালিয়ে গেলেন। শাহজাহান আগ্রাতেই রয়ে গেলেন। এখানেই কাহিনীর রূপ হলো অন্যরূপ।

শাহজাহানের দ্বৈত ভূমিকা ঃ একটি ষড়যন্ত্র

আমরা তো জেনেছি সামুগড়ের যুদ্ধে আওরঙ্গজেব জয়ী হলেন। তবে তিনি জয়ী হয়েই বসে রইলেন না। বরং পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি আগ্রায় এসে বাগেনূর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আর ভাবেন, কি করে পিতাকে বোঝানো যায় যে, তিনি ইচ্ছে করে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়েন নি। বরং ভাইয়ের হাত থেকে জীবন তথা সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্যই কেবল যুদ্ধ করেছেন! অনেক ভাবলেন তিনি। ভাবলেন, অন্তত পিতার কাছে একখানা চিঠি লেখা যাক। তাই তিনি অনুনয় করে পিতার কাছে লিখলেন—

facebook/@maktabatuttalamij

'আব্বা, এ যুদ্ধের জন্য আমি দায়ী নই। বরং দারাই আমাকে এ যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে। কারণ, তাঁর হঠকারিতা রাজ্য তথা জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই আমাকে ক্ষমা করবেন।'

এ চিঠি পেয়ে সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে একখানা তরবারি উপহার দিয়ে পাঠান। তখন থেকেই শাহজাদা আওরঙ্গজেবের নামের সাথে যোগ হলো আলমগীর। আর তাঁর পুরো নাম হলো আওরঙ্গজেব আলমগীর। এ সময় শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে কেবল আলমগীর উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। বরং তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের শুভাকাঙ্ক্ষীরা এতে রাযী হলো না। কারণ, তারা ভাবলো, সম্রাট আওরঙ্গজেবকে বন্দী করার ফিকির খুঁজছেন। তা না হলে যে মানুষ দারার প্রতি স্নেহে অন্ধ ছিলেন, এমনকি স্নেহের অন্ধত্বে দিল্লীর গভর্নরকে পর্যন্ত সমস্ত ধনরত্ন এবং কোষাগার দারাকে দিয়ে দিতে বলেছিলেন, সে মানুষ কি করে এত তাড়াতাড়ি আওরঙ্গজেবকে এত ভালোবাসতে পারেন? এ কথাটুকুই আরওঙ্গজেবকে ভালো করে বোঝানো হলো। তাই তিনি পিতার সাথে আর দেখা করলেন না। বরং ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন আপন পুত্র মুহাম্মদকে আগ্রার দুর্গ অবরোধ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে বলে দিলেন যে, শাহজাহানকেও যেন কড়া নজরে রাখা হয়। কারণ, ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব পিতার একখানা গোপন চিঠিও ধরে ফেলেছেন। এ চিঠি দারার কাছে লেখা হয়েছিলো। তাতে লেখা ছিলো যে, শাহজাহান শিগগিরই তাঁর পথের কাঁটা আওরঙ্গজেবকে সরিয়ে ফেলবেন।

অপর দিকে তিনিই আবার আওরঙ্গজেবকে লিখেছেন। তিনি চিঠিতে অনেক স্নেহ বিলিয়েছেন তাঁকে। বলেছেন, রাজ্যের এতসব গোলযোগের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিহিত হওয়া উচিত। এ চিঠি পেয়ে আওরঙ্গজেব সত্যি সত্যি পিতার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, পিতা বুঝি সব ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই আওরঙ্গজেব আগ্রায় যাবার জন্য তৈরি হলেন। কিন্তু ঠিক সে সময়ই গুপ্তচরের মারফত খবর এলো, খবরদার, শাহজাদা

facebook/@maktabatuttalamij

আওরঙ্গজেব যেন আগ্রায় ঘুণাক্ষরেও না যান। তিনি সেখানে গেলে তাঁকে বন্দী করে হত্যা করা হবে। এ কথা জাহানারা সব দ্বাররক্ষীদের বলে দিয়েছেন। কিন্তু সম্রাট এবং শাহজাদী জাহানারা এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেও শাহজাদী রওশনারা তা সবটুকুই সেই দূতের মাধ্যমে আরওরঙ্গজেবকে জানিয়ে দিলেন। কারণ, জাহানারা দারার পক্ষে হলেও রওশনারা ছিলেন আওরঙ্গজেবের শুভাকাঙ্ক্ষী। কাজেই কিছুই রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র আওরঙ্গজেবের কাছে গোপন রইলো না। তাছাড়া সম্রাটের চিঠি তো আগে থেকেই পেয়ে গেছেন। কাজেই শাহজাহানের দ্বৈত ভূমিকার কথা আওরঙ্গজেবের কাছে আর বুঝতেও বাধা রইলো না। তাই তিনি আগে থেকেই সতর্ক হলেন এবং সে জন্যই পুত্র মুহাম্মদকে আগ্রার দুর্গ অবরোধ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আর সেই কথা বলে দিলেন যে, শাহজাহানকেও যেন কড়া নজরে রাখা হয়। আর এই কড়া নজরে রাখাকেই অনেকে বলেন আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করেছিলেন; আসলে এটা পিতাকে বন্দী করা ছিলো না। বরং বলা যায় পিতার প্রতি সন্দেহমুক্ত হবার এক শুভ সময়।

কিন্তু এতসব প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব পিতাকে একটুও কম শ্রদ্ধা করেন নি। আর তিনি কখনো পিতার অনিষ্টের কথাও ভাবেন নি। বরং বারবার পিতার কাছে বিনয় প্রকাশ করে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। তাছাড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব রকম ব্যবস্থাই নিয়েছেন। এমনকি রাজকার্য পরিচালনায় তাঁর পরামর্শ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। আর এ মধুর ব্যবহারে দিন দিন সম্রাটের রাগও পড়ে গেল। তিনি একদিন আওরঙ্গজেবের প্রতি সদয় হলেন।

পথভ্রষ্ট মুরাদ ও তাঁর প্রাণদণ্ড

কিন্তু এদিকে মুরাদকে নিয়ে হলো দারুণ ফ্যাসাদ। তিনি অন্যের বুদ্ধি শুনে ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে ফেললেন। কারণ, ইতিপূর্বে তিনি সামুগড় যুদ্ধে সাংঘাতিক বীরত্বের পরিচয় দিয়ে জয়লাভ

facebook/@maktabatuttalamij

করেছেন। তাই চতুর লোকেরা তাকে ফুসলিয়ে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিলো। তারা বললো, 'আপনি না হলে আওরঙ্গজেব কিছুতেই সামুগড় যুদ্ধে জয়ী হতে পারতেন না। আপনি বীর, বীরের মত থাকবেন। আর রাজ্যের মালিক হওয়া তো আপনারি সাজে। খামাখা আপনি কেন আওরঙ্গজেবের বুদ্ধিমত চলবেন?' একথা শুনেই মুরাদের ভিমরতি ধরেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, 'আমি যখন একাই এতবড় যুদ্ধ জয় করেছি, তখন আলমগীরের সাথে আমার সম্বন্ধ কি? এ রাজ্য তো আমার।' এ ভেবেই সে আলমগীরের বড় বড় অফিসারদেরকে বহু টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে নিজের দলে ভিড়াতে শুরু করলেন। এভাবে বিশ হাজার সৈন্য আলমগীরের পক্ষ ত্যাগ করে মুরাদের সাথে মিলিত হলো। আর এটাই ছিলো আলমগীরের বিরুদ্ধে মুরাদের সাংঘাতিক যুদ্ধের প্রস্তুতি। অথচ আওরঙ্গজেবের তাঁর চুক্তিই ছিলো আগে। সে চুক্তিতে বলা হয়েছিলো, যুদ্ধে যে ধনসম্পদ লাভ হবে তার তিন ভাগের একভাগ মুরাদকে দেয়া হবে। তাছাড়া, তাঁকে পাঞ্জাব, কাবুল ও কাশ্মীর প্রদেশ তিনটি ছেড়ে দেয়া হবে। আর আওরঙ্গজেব সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ইতস্তত করলেন না। তিনি সামুগড় যুদ্ধে জয়ী হয়েই মুরাদকে বিশলক্ষ টাকা নগদ দিয়ে দিলেন। আর কথা দিলেন, দারার একটা ব্যবস্থা করে তিনি তাঁকে পাঞ্জাব, কাবুল ও কাশ্মীর ছেড়ে দেবেন। কিন্তু মুরাদ অন্যের বুদ্ধি শুনে ঐ কাজটি করে বসলেন।

কিন্তু রাজ্যে এত গোলযোগ হলে তো রাজ্য চলে না। তাই আওরঙ্গজেব ভাইয়ের কারণে দেশের অগণিত জনসাধারণকে দুঃখে ফেলতে চাইলেন না। তিনি মুরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে বরং তা এড়িয়ে গেলেন। কারণ, মুরাদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে যে শত শত মানুষের প্রাণ হানি হতো সে কথা আর বলা যায় না। তাছাড়া, সে মুহূর্তে রাজ্যেরও যে কত ক্ষতি হতো সে কথাও বলা মুশকিল। তাই আওরঙ্গজেব অগত্যা নিরুপায় হয়ে সহজ পন্থা বেছে নিলেন। তিনি মদে মাতাল

facebook/@maktabatuttalamij

মুরাদকে বন্দী করালেন। আর বিচারে তার প্রাণদণ্ড দিলেন ১৬৬১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। এখানেই অনেকে বলে থাকেন আওরঙ্গজেব মুরাদকে এক ভোজে দাওয়াত করেন। আর ভোজের শেষে তাকে প্রচুর মদ পান করান। আর মাতাল ভাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। আসল ব্যাপার হলো, একে মুরাদ রাজদ্রোহীর অপরাধে অপরাধী, তার উপর আবার খুনের সাথেও জড়িত ছিলেন তিনি। অথচ রাজপুত্র বলে তাঁকে ক্ষমাও করা যায় না। তাছাড়া চুক্তি ভঙ্গ করাতে ইতিমধ্যে রাজ্যের বিশৃঙ্খলাও চরমে উঠেছে। তাই আওরঙ্গজেব আর কি করেন। মনে না চাইলেও রাজ্যের খাতিরে, রাজ্যের মানুষের খাতিরে তাঁকে বিচারে প্রাণদণ্ড দিলেন। এটা যদি তাঁর অন্যায় হয়ে থাকে তবে রাজ্যের মানুষকে বাঁচানোর তো কোন অর্থই হয় না। আর ভাইকে বিচারে ক্ষমা করে তিনি জনসাধারণের প্রতি চরম অন্যায়ই করতেন। অথচ ইতিহাসের পাতায় এই ন্যায় বিচারক সম্রাটকে ইসলামের শত্রুরা কতই না জঘন্যভাবে চিত্রিত করেছে।

যাই হোক, আওরঙ্গজেব মুরাদের ষড়যন্ত্র থেকেও রাজ্যকে বাঁচালেন। এর পর রাজ্য কিছুটা বিপদমুক্ত হয়ে গেল। তিনি ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই দিল্লীতে পৌঁছে সিংহাসনে বসলেন। উযির মন্ত্রীরাও একে একে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলো। সবাই তাঁর সহযোগিতা করলো। তাছাড়া, তাঁর মামা খান জাহান শায়েস্তা খানও তাঁকে কম সাহায্য করলেন না। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে শাহজাহানকে আওরঙ্গজেবের প্রতি সহায় করে তুললেন। আর এ জন্যই আওরঙ্গজেব আগ্রায় এলে বৃদ্ধ সম্রাট তাঁকে সেই 'আলমগীর' খোদাই করা তরবারিখানা উপহার দেন।

দারার প্রাণদণ্ড

এদিকে দারাশিকোহ কিন্তু বসে রইলেন না। তিনি পুনরায় তাঁর সিংহাসন উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সে চেষ্টায় সম্রাট

facebook/@maktabatuttalamij

শাহজাহানেরও গোপন সমর্থন ছিলো। তিনি আগ্রা থেকে দারার জন্য পাঠিয়ে দিলেন প্রচুর অর্থ। আর কাবুলের শাসনকর্তা মহবত খানকে দিলেন চিঠি লিখে, তিনিও যেন দারাকে সব রকম সহযোগিতা করেন। তাছাড়া, লাহোরের অর্থ–সম্পদ ছিলো দারার দখলে। আর দিল্লীর ধন ভাণ্ডারে তিনি পেয়েছেন এক কোটি টাকারও বেশি টাকা। এ অর্থ দিয়েই তিনি বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে ফেললেন। অপরদিকে রানা যশোবন্ত সিংহও দারাকে আজমীরে ডেকে পাঠান। তিনি নিজে যুবরাজকে সব রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন।

এ খবর যথাসময়ে আওরঙ্গজেবের কানে পৌঁছলো। তিনিও অদম্য উৎসাহে সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। তিনি নিজে সেনা ছাউনী ঘুরে ঘুরে তদারক করতে শুরু করলেন সবকিছু। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সাথে মেলামেশা করে সবার আপন হয়ে উঠলেন। এমনকি যশোবন্ত সিংহও আওরঙ্গজেবের মধুর ব্যবহারে তাঁর দলে ভিড়ে গেলেন। কিন্তু, দারা তা আদৌ ভাবতে পারেন নি। তাই তিনি যখন যশোবন্ত সিংহের আহ্বানে আশ্বস্ত হয়ে সসৈন্যে আজমীর চলে যান তখন বুঝলেন সবকিছু। দেখলেন, যশোবন্ত সিংহ আর তার দলে নেই। অপরদিকে আওরঙ্গজেবও কঠিনভাবে সুসংগঠিত হয়েছেন। তাই হতাশ হলেন দারা। কিন্তু তবুও দেওয়াই–এর গিরিপথ অধিকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন।

দারা প্রথমে গুজরাটে যান। কিন্তু আওরঙ্গজেবের বাহিনী সেখানেও তাঁকে তাড়া করলো। এবার দারা চলে গেলেন আহমদাবাদে। কিন্তু আহমদাবাদের গভর্নর তাঁকে সাদরে প্রবেশ করতে দিলেন না। তারপর দারা দাদরের বালুচী নেতা মালিক জিওয়ানের আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে গমন করেন। কারণ, তিনি এক সময় মালিক জিওয়ানকে শাস্তি হতে রক্ষা করেন। এক সময় তিনি ভেবেছিলেন মালিক জিওয়ান তাঁর

facebook/@maktabatuttalamij

সে কথা স্মরণ রেখেছেন। কিন্তু পরিণামে সে আশা তাঁর পূরণ হলো না। বরং মালিক জিওয়ান আওরঙ্গজেবের বাহিনীর হাতে ধরিয়ে দিলেন দারাকে। অথচ দারা পত্নী ও পুত্র সিফির শিকোহ্ উভয়ে দাদরে না যাওয়ার জন্য দারাকে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিলেন। কিন্তু দারা তা শোনেন নি। তবুও দারার বিশ্বস্ত পত্নী, নাদিরা বেগম তাঁর সাথী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরিণামে সর্বস্বান্ত হয়ে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। আর দারা ও তাঁর পুত্র সিফির শিকোহ ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট বন্দী অবস্থায় দিল্লী পৌঁছেন।

কিন্তু দিল্লী পৌঁছেই সব শেষ হয়ে গেল না। রাজ্যের আইন অনুযায়ী তাঁদের বিচার শুরু হয়ে গেল। দারা আওরঙ্গজেবের বড় ভাই হলে হবে কি? তিনি তো আইনত বিদ্রোহী। তাঁর দ্বারাই তো যতসব অনাসৃষ্টি। তাই তাঁর বিচার হওয়া একান্তই প্রয়োজন। এ জন্যই দারার ভাগ্য নিয়ে উচ্চ পদস্থ অফিসারদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বসে গেল বিচারকমণ্ডলী। কারণ, আওরঙ্গজেব তো একাই কিছু করতে পারেন না। তার তো আইনসভা রয়েছে। আর বিচারকমণ্ডলীও আছে। কাজেই তিনি একাই দারার বিচার করে অবিচার করবেন কেন?

বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে কেবল দানিশ খান দারাকে বন্দী করে রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাকি সবাই দারার অপরাধের শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ডের রায় দিয়েছিলেন। এ রায়ের পক্ষে শায়েস্তা খানও মত দিয়েছিলেন। তাই বিচারে দারার প্রাণদণ্ড কার্যকরী করা হলো। সে দিন ছিলো ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর।

দারার মৃত্যুদণ্ডের কারণেও অনেকে অনেক কথাই বলেন। কেউ বলেন দারা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। অথচ তাঁকে বন্দী করেই আওরঙ্গজেবের করুণ অবস্থায় একটি কুৎসিত হাতীর পিঠে চড়িয়ে লাঞ্ছনা ও অপমানিত করার আদেশ দেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। বরং দারার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এসব ষড়যন্ত্র করে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছিলো। আর এসব ষড়যন্ত্রের

facebook/@maktabatuttalamij

মূলে ছিলো হায়বাত নামে এক ব্যক্তি। সে-ই শহরময় মিথ্যা প্রচার করে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়েছিলো, যাতে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে চারদিক থেকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। আর আওরঙ্গজেব পরাজিত হলে কি তিনিও রেহাই পেতেন দারার কাছ থেকে? আসলে তিনিও রেহাই পেতেন না। কারণ, মোগলরা বংশানুক্রমে এমন মারামারি কাটাকাটি জিইয়ে রেখেছে। আর শাহজাহানও তো একইভাবে ভাই-ভাতিজাকে হত্যা করে সিংহাসনে চেপে বসেছেন।

দারা যখন বন্দী হয়, সুজা তখনও বাংলার নবাব। দারা তাঁর কাছেও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। আর সুজা সে আহ্বানে সাড়াও দিয়েছিলেন। তাই তিনি বেরিয়েছিলেন আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তিনি সসৈন্যে এসে জৌনপুর দখল করে নিলেন। অথচ সুজা সোলায়মান শিকোহর সাথে পরাজিত হয়ে ১৬৫৮ সালে এক সন্ধি করেছিলেন। এ সন্ধির শর্ত অনুসারে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভার তাঁর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সে সন্ধি করেও আওরঙ্গজেবকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই তিনি ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে খজওয়া নামক স্থানে আওরঙ্গজেবের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু বিধি বাম হলে সবই বিফল হয়। তাই সুজা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন আরাকানে। আরাকানে মগরাজা তাকে আশ্রয়ও দিলেন। কিন্তু পরে তাঁর সাথে সুজার ভুল বোঝাবুঝি হলো। ফলে সুজা আরাকান রাজার হাতে সপরিবারে নিহত হলেন।

এইবার আওরঙ্গজেব সম্পূর্ণভাবে নিষ্কন্টক হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভাইদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। এবার তিনি মনোযোগ দিলেন রাজ্যের দিকে। কিসে প্রজাসাধারণের মঙ্গল হবে, কিসে রাজ্যের উন্নতি হবে, সে কথাই তাঁর রাতদিনের ভাবনা। আর ভাবনা তাঁর পিতা, বোন ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে কি করে সাথে রাখা যায়। তাদেরও তো এতটুকু শান্তি চাই। তাই তিনি তাদের জন্যও

facebook/@maktabatuttalamij

মন খুলে দিলেন। তিনি বৃদ্ধ পিতার সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ নজর দিলেন। আর সেই বোন জাহানারার প্রতিও সদয় হলেন, যিনি তাঁর বিরুদ্ধে সব-সময়ই ষড়যন্ত্র করতেন। এমনকি আওরঙ্গজেবকে হত্যার ফন্দিও করেছিলেন সেই বোন। কিন্তু তাঁরও কোনো অভাব রাখলেন না আওরঙ্গজেব। শুধু তাই নয়, তার ভাই দারা ও মুরাদের সন্তানরাও তাঁর অবহেলা পায়নি কখনো। তাদেরকে তিনি এতই আপন করে নিয়েছিলেন যে, দারার ছেলের সাথে আপন মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, আওরঙ্গজেব এখন ভারত সম্রাট। তাঁকে কেবল পরিবারের ভরণ-পোষণ করলে চলবে কেন? তার তো দায়িত্ব আল্লাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তিনি ছোটবেলায় যে শিক্ষালাভ করেছিলেন তার আলো সারাদেশময় ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। কারণ, মাটির পৃথিবীতে মাটির পৃথিবীর স্রষ্টার নিয়ম-কানুনই তো কেবল মানুষের শান্তি দিতে পারে। আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠার সব দায়িত্ব তো মানুষের। বিশেষ করে রাজ্যের সর্বময় শাসনকর্তার। তাই আওরঙ্গজেব সেদিকেই মনোযোগ দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র খলীফার মত দেশময় আল্লাহ্‌র আইন-বিধান চালু করে দিলেন।

এখানেই খলীফা কথাটা বুঝে নেয়া দরকার। খলীফা হলো প্রতিনিধি। যেমন একদেশ থেকে আর একদেশে রাষ্ট্রদূত পাঠানো হয় তেমন। রাষ্ট্রদূত কিন্তু তাঁর দেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা সরকারের নির্দেশ মত চলতে বাধ্য। যদি তা না চলে তবে অবশ্যই তার পদ বাতিল করে দেওয়া হয়। কারণ, সে হলো রাষ্ট্রদ্রোহী। তেমনি মানুষও কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৃথিবীতে রাজ প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূত। তারা যদি আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবন বিধান কিংবা আইন কানুন অনুসরণ না করে তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি আর রইলো না। বরং তারা হলো আল্লাহ্‌দ্রোহী। এটা নিশ্চয়ই মহা অপরাধ। আর রাজ্যের রাজার বেলায় এ কথা তো আরো সাংঘাতিক। কারণ, রাজার

facebook/@maktabatuttalamij

উপর জনসাধারণের ঈমানদারীত্বের প্রায় সবকিছুই নির্ভর করে। আর সরকার যে ভাবে দেশ চালাতে চাইবে দেশের জনসাধারণকেও সে ভাবেই চলতে বাধ্য হতে হবে।

এ কথাগুলোই বুঝেছিলেন আওরঙ্গজেব। তিনি বুঝেছিলেন গোটা দেশের মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বানাতে গেলে সম্রাটকেই এগিয়ে আসতে হবে প্রথম। আর এগিয়ে এসে কিছু রীতি–নীতির রদবদল করে সংস্কার সাধন করতে হবে দেশের। তাই তিনি মন দিলেন সে কাজে। তাছাড়া, ছোটবেলার শিক্ষাই তাঁকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলো বেশি। তিনি আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী রাজ্যের নিয়ম–কানুন পরিবর্তন করতে শুরু করলেন। আর একের পর এক উন্নতির পথে অগ্রসর হলেন।

আওরঙ্গজেবের সংস্কার ও দেশসেবা

আওরঙ্গজেব আলমগীর সিংহাসনে বসেই ভাবলেন মানুষের নৈতিক চরিত্র ভালো করতে হবে। কারণ, যে মানুষের ভিতরে ন্যায়নীতি থাকে না সে মানুষ কখনো আদর্শ মানুষ হতে পারে না। আর তার মাধ্যমে কখনো মানুষের সেবা হয় না। এ জন্য তিনি ইসলামী শিক্ষা পরিকল্পনার দিকে বিশেষ নজর দিলেন। আর এ উদ্দেশ্যে ইহ্‌তেসাব বিভাগ খুলে দিলেন। এ বিভাগে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদেরকে বলা হতো মোহতাসেব। মোহতাসেবদেরকে প্রত্যেক জেলায় নিযুক্ত করা হলো। তাঁদের কাজ হলো সৎ কাজের প্রচলন করা। আর অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে দূরে রাখা। এ বিভাগের হেড ছিলেন মোল্লাহ্‌ অজিহ উদ্দিন। তিনি এর দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

ইহতেসাব বিভাগের কাজকে সুন্দরভাবে করার জন্য আওরঙ্গজেব ফিকাহ্‌ এবং হাদীস শিক্ষার দিকে বিশেষ জোর দেন। এ জন্য প্রত্যেক গ্রামে ধর্মীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন। অধিকন্তু তিনি রাজ্যের সব মসজিদকে তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করেন। কারণ, তিনি

facebook/@maktabatuttalamij

বুঝেছিলেন মসজিদের শিক্ষাই প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারে। এ জন্য তিনি ইমাম থেকে শুরু করে মুয়াযযিন ও বক্তাদের নিযুক্ত করেন এবং তাদের রাজভাণ্ডার থেকে বেতনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাদের বেতন দৈনিক তিন টাকার বেশি ছিলো না। তাছাড়া, আওরঙ্গজেব বিভিন্ন মতের লোকদের মধ্যে একটা ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন মুসলমান সবাই এক। তারা ফেরকাবন্দী হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হলে কিছুতেই মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। তাই তিনি ছোট ছোট মতপার্থক্যের মীমাংসার পরিকল্পনা করেন। এ জন্য তিনি বিভিন্ন দেশের বড় আলিম নিয়ে একখানা ফতোয়ার গ্রন্থ লেখার উদ্যোগ নেন। অধিকন্তু এ কাজের জন্য একটি সমিতিও গঠন করে দেন। আর মোল্লা নিজামকে এই সমিতির প্রধান অফিসার নিযুক্ত করেন। তিনি তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে কয়েক বছরের সাধনায় 'ফতোয়া-ই-আলমগীর' রচনা করেন। আরব ও তুর্কীরা যাকে বলে 'ফতোয়া হিন্দিয়া'। এই সেই বিখ্যাত ফতোয়ায়ে আলমগীর, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। আর সেকালের অনেক মতভেদের মীমাংসা এর মাধ্যমেই হয়েছিলো।

মুসলিম সংস্কৃতির দিকেও আওরঙ্গজেব ঝুঁকে পড়লেন। কারণ, একটি জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে তাঁর সংস্কৃতি। আপন সংস্কৃতির চর্চা ছাড়া কোনো জাতি তার আপন পরিচয় দিতে পারে না। আর এর মধ্যেই চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আওরঙ্গজেব দেশের প্রচলিত অনুষ্ঠানাদির দিকে নজর দিলেন। তিনি দেখলেন দেশে এমন কতকগুলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, যেগুলো আদৌ জনসাধারণকে আদর্শবান করে গড়ে তোলে না। তাই তিনি কঠিনভাবে সেগুলোর সংস্কার সাধন করেন। কারণ, এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিরকী করা ছাড়া আর কিছু হতো না। অধিকন্তু ইসলামী পরিবেশ নষ্ট হয়ে বিধর্মীদের সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান সেখানে চলতে শুরু করেছিলো। বিশেষ করে সম্রাট আকবরের সময় তো এ সংস্কৃতি একেবারে ইসলামের

facebook/@maktabatuttalamij

সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো। রাজদরবারে পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে পাগড়ি পরা, অলংকার পরা, সবই হিন্দুয়ানী হয়ে উঠেছিলো। এমনকি দরবারে সালামের পরিবর্তে সিজদা বা ভূমিচুম্বন প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিলো। অধিকন্তু মুসলমান রাজকর্মচারীদের মাথায়ও টিকির প্রচলন হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, মুসলমানরা অনায়াসে হিন্দুদের সাথে মিলে গিয়ে হিন্দু মেয়ে পর্যন্ত বিয়ে করতে শুরু করেছিলো। আওরঙ্গজেব এসবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কিন্তু এসবের পরিবর্তে ইসলামী প্রথা, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি চালু করেন। এমনকি তিনি পার্শীদের অনুকরণে সূর্যমাস গণনার পরিবর্তে চান্দ্রমাস গণনার প্রচলন করেন।

অনেকে মনে করতে পারেন এসব ছোটখাট বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু 'ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।' একথা আওরঙ্গজেব বুঝেছিলেন। তাছাড়া, এসব ছোট ছোট ব্যাপারের মধ্যে অনেক জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। তাই তিনি মুসলমান সংস্কৃতির প্রচলন হিসাবে সালাম প্রথা চালু করেন। তাছাড়া শাহী দরবার রীতিমত নাট্যশালা আর গান-বাজনার আসরে পরিণত হয়েছিলো। এসব গান-বাজনা আর আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে অনেক অনাসৃষ্টিও হতো। যার ফলে নৈতিক অধঃপতন এসেছিলো অতি সহজে। সেখানে মদপান রীতিমত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আর জুয়া খেলার কথা না হয় বাদই দিলাম। তাছাড়া তারা লোকসঙ্গীতের কৃত্রিম মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শোভাযাত্রা করতো। এভাবে মুসলমানরাও পুতুল পূজারী হতে শুরু করেছিলো। কিন্তু আওরঙ্গজেব কঠিনভাবে এ প্রথাগুলো উৎখাত করেন। তিনি নবীর আদর্শ অনুসারে সবকিছু পরিবর্তন করেন। এমন কি মদপান করা, জুয়াখেলা ইত্যাদি অসামাজিক কাজ শক্ত হাতে দমন করেন। আর তার পরিবর্তে নামায-রোযাকে সরকারীভাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বাধ্যতামূলক করে দেন। এ আদেশ কেউ যথাযথভাবে পালন করছে কিনা, তার তদারকের

facebook/@maktabatuttalamij

ভার দেন মোহতাসেবদের উপর। তারা তদারক করে কোথাও কোনো আইন অমান্যের কিছু দেখলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। এমনিভাবে দেশে গাঁজা ভাং-এর চাষ বন্ধ হয়ে গেলো।

এ সময় আওরঙ্গজেব আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। সম্রাট শাহজাহানের সময় হিন্দুরা মুসলমানদের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করেছিলো। তারা জোর করে মুসলমান মেয়েদেরকে ধরে রাখতো এবং পরে বিয়ে করতো। এ ধরনের ধর্ষিতা মেয়েকে শাহজাহান উদ্ধার করেছেন মাত্র। কিন্তু হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করেন নি। এমনকি এ সময় হিন্দুরা মুসলমানদের মসজিদগুলো পর্যন্ত ভাঙতে শুরু করেছিলো। এর উদাহরণ, বিজয় নগরের রাজা রামরাজ। তিনি আলি আদেল শাহকে সাহায্য করতে আসার নাম নিয়ে মসজিদগুলো ভেঙে ফেলতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, অনেক মুসলমানকে দেশছাড়া করেন। এমনকি অনেক মসজিদে মূর্তি পূজা থেকে শুরু করে গান-বাজনার নিয়মিত আসর চালু করেন। আর দারাশিকোহর সময় হিন্দুরা আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। কারণ, দারাশিকোহ প্রকাশ্যে হিন্দুদের সাথে পূজো দিতেন এবং হিন্দুধর্মকে উৎসাহিত করতেন। কেবল তাই নয়, তিনি প্রকাশ্যে হিন্দুত্ব প্রকাশ করতেন। আর উপনিষদ অনুবাদ করে তাতে পরিষ্কার লেখেন যে, কুরআন এবং উপনিষদের মধ্যে পার্থক্য নেই।

এ সময়েই হিন্দুরা মুসলমান ছেলে-মেয়েদেরকে জোর করে হিন্দু-ধর্ম পুস্তক পড়াতে আরম্ভ করে। এ জন্য তারা বেশ কিছু স্কুলও খুলে দেয়। আর মুসলমান ছেলেদেরকে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে হিন্দু হতে উৎসাহ দেয়। এভাবে মুসলিম সন্তানরা হিন্দুদের কবলে পড়ে হিন্দু হতে শুরু করে। এজন্য আওরঙ্গজেব এগুলোর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা করেন। তিনি ঐ বিশেষ স্কুলগুলো বন্ধ করে দেন এবং মুসলমানদেরকে হিন্দুদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচান। ফলে হিন্দুরা ভীষণ ক্ষেপে গেল। তারা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটিয়ে দিল। এমনকি খণ্ডিলার

facebook/@maktabatuttalamij

রাজপুতরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। তারা বললো, আওরঙ্গজেব হিন্দুদের ধর্ম ও মন্দির আক্রমণ করেছে। সে হিন্দু স্কুলসমূহ ধ্বংস করেছে ইত্যাদি। আর এটাই ইসলামের শত্রুরা ফলাও করে ইতিহাসে লিখে ফেললো। তারাও বললো, আওরঙ্গজেব দারুণ হিন্দুবিদ্বেষী। সে হিন্দুদের গির্জা-মন্দির, স্কুল-পাঠাগার ইত্যাদি ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ আওরঙ্গজেব রাজ্যের বিদ্রোহ ও হিন্দুদের অপকর্মের প্রতিরোধ করেছেন মাত্র। মন্দির ভাঙ্গার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, আওরঙ্গজেবের দরবার থেকে হিন্দু রাজকর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করার যে অপবাদ দেয়া হয় তাও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ, আওরঙ্গজেবের রাজদরবারে অনেক হিন্দু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাজভীম-সিংহ, ইন্দ্রসিংহ, বাহাদুর সিংহ, রাজা মানসিংহ, এচলাজি (শিবাজীর জামাতা), অর্জ্জুজী, মানকুজী, রাও অনুপ সিংহ, রাজা অনুপ সিংহ, রাজা উদয়াদিত্য সিংহ, উদয় সিংহ, বাসুদেব সিংহ, কাহ্নজিমিরকু, বসন সিংহ, রামচাঁদ, কোকচাঁন্দ, ঝাকুনজবা, জকিয়া, দুর্গাদাস রাঠোর, রূপ সিংহ, সুভান, শিব সিংহ, মান্দান, কিশোর দাস, রাজা কালিয়ান সিংহ ইত্যাদি প্রধান।

রাজদরবারে কবিদের মর্যাদা ছিলো অনেক বেশি। তাঁদেরকে অনেক বড় বড় পদে প্রতিষ্ঠিত করা হতো। তাঁরা প্রচুর টাকা বেতন পেতেন। কিন্তু তাঁরা তার প্রতিদান দিত অন্যভাবে। তাঁরা বাদশাকে খুশি করার জন্য সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে আনতেন। আর সে সব কবিতায় বাদশাকে খোদার সমতুল্য করে দেখাতেন। কিন্তু এভাবে মানুষকে খোদার আসনে বসানোর ফলে ফল হলো অন্যরূপ। সাধারণ মানুষ রীতিমত বাদশাকে সিজদা করতে শুরু করলো। আর আকবরের সাথে সাক্ষাত করা তো উপাসনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। প্রতিদিন সকালে একদল লোক এ উপাসনা পালন করতো। তাঁরা আকবরের দর্শন ছাড়া অন্ন-জল গ্রহণ করতো না। এমনকি দরবারে বাদশাকে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করা হতো। অবশ্য

facebook/@maktabatuttalamij

শাহজাহানের সময় এ প্রথা ভূমিচুম্বনে পরিণত হয়। কিন্তু তাও সিজদার দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র।

এসব ব্যাপার আওরঙ্গজেবের হৃদয়ে ভীষণভাবে আঘাত করেছিলো। তিনি বুঝেছিলেন মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব। সে কেন মানুষের পায়ে মাথা নত করবে? মানুষ হিসাবে সবাই তো সমান। আল্লাহ্‌র কাছে তো কেউ ছোট-বড় নয়। সেখানে তো উযীর, নাজির, বাদশাহ্, ফকির সবাই একই বেশে যায়। আওরঙ্গজেব এসব জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তাই তিনি বাদশাহকে দর্শন করে পানাহারের শিরকী প্রথা বন্ধ করে দিলেন। সাথে সাথে তিনি কবিদের পদবীও রাজদরবার থেকে উঠিয়ে দিলেন।

আওরঙ্গজেব বিভিন্ন অপব্যয়মূলক অনুষ্ঠান একেবারেই বন্ধ করে দিলেন। কারণ, ইসলাম কখনো অপব্যয় পছন্দ করে না। বিশেষ করে ইসলাম বিলাসী জীবনকে ঘৃণা করে। বিলাসী জীবন এক অর্থে শয়তানের অনুপ্রেরণা। তাছাড়া, বিলাসী মানুষ কখনো সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বোঝে না। একথা রসূল (সা)-এর বাণীতেও পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেব দরবারের সমস্ত অপব্যয়ের পথ বন্ধ করে দেন। এমনকি নওরোজ মিছিলে বড় বড় আমির ওমরাহ্‌র জন্য বহুমূল্যের সামগ্রী নজরানা উৎখাত করে দেন।

দরবারের অযথা জাঁকজমক, সাজসরঞ্জামও তিনি খুলে ফেলে দেন। কারণ, দেশের মানুষ না খেয়ে মরবে, শাহী দরবারের ঐসব সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে কি হবে? এজন্য তিনি রূপার দোয়াতের পরিবর্তে চীনা মাটির দোয়াত ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। তাছাড়া, সে সময় রূপার থালায় দানের জিনিস উপহার দেওয়া হতো। আওরঙ্গজেব সেগুলোকেও সাধারণ থালায় দেবার জন্য নির্দেশ দেন। আর এভাবে তিনি মানবতাকে সামনে নিয়ে ন্যায় বিচারে হাত দেন।

আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাঁর সুবিচার। কারণ, বিচারের সময় তিনি আপন-পর, ধনী-গরীব,

facebook/@maktabatuttalamij

শত্রু-মিত্র ইত্যাদি কোনো ভেদাভেদ করতেন না। এমনকি তিনি শাহজাহাদেরকেও সে ব্যাপারে সমান মনে করতেন। আপন ছেলে বলে অন্যায় করে বেঁচে যাবে একথা ন্যায় বিচারক আওরঙ্গজেবের বেলায় হবে কেন? এখানেই একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে।

'মীর্জা কামবক্স আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পুত্র ছিলেন। এই প্রিয়পুত্রের বন্ধু ছিলো কোকা নামে এক ব্যক্তি। সে এক খুনের সাথে জড়িত ছিলো। কিন্তু কামবক্স কোকাকে রক্ষার ব্যাপারে সহায়তা করছিলো। এ কথা যথা সময়ে আওরঙ্গজেবের কানে গেল। তিনি কোকার সাথে কামবক্সকেও বন্দী করার আদেশ দেন। কারণ, যে দোষীকে সাহায্য করে আইনত সেও সমান অপরাধী। তাই তিনি কামবক্সকেও আপন পুত্র বলে রেহাই দিলেন না। বরং তাঁর উচিত বিচার করে শাস্তি দিলেন। এ ঘটনায় কে না স্বীকার করবে আওরঙ্গজেবের ন্যায় বিচারের কথা।'

এ জন্যই আওরঙ্গজেবের দরবারে দেশী-বিদেশী ছোট-বড় পদস্থ-অপদস্থ সবাই সমান। আর সমান বলেই বিচারের সময় সবার কথা সমানভাবে শুনে তুলাদণ্ডের মত চুলচেরা বিচার করতেন তিনি। তাই তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্বকালে অত্যাচারমূলক কোনো ঘটনাই কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। কারণ, তিনি তাঁর রাজ্যে অযথা শানশওকত, নাচ-গান, আনন্দ-উৎসবের ঘটা পর্যন্ত কমিয়ে দিয়ে বরং রায়তদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সেবাকে তাঁর কর্তব্য বলে বেছে নিয়েছিলেন। সে কথা তাঁর পত্রপত্রিকা থেকেও পাওয়া যায়। তিনি তাঁর পত্রে লেখেন, "রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণ, নিজের কামনা-বাসনার চরিতার্থতা বা লাম্পট্য নয়।..........তিনি আরো লেখেন, "আমি আওরঙ্গজেব নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য বেঁচে থাকতে এবং পরিশ্রম করতে আল্লাহ্ কর্তৃক এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।...........একজন শাসনকর্তার উপর যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, তা হল কষ্ট ও বিপদের সময় তাঁর জীবন দিয়ে হলেও জনসাধারণের হেফাজত করা। প্রয়োজন হলে সেজন্য মৃত্যুকে

facebook/@maktabatuttalamij

বরণ করা।" এ সব থেকেই বোঝা যায়, আওরঙ্গজেব কত বড় ন্যায়-বিচারক ছিলেন। আর তাঁর পুত্রদেরকেও তিনি এমনিভাবে ন্যায় বিচারের জন্য চিঠি দিয়ে সতর্ক করে দিতেন।

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তিনি অত্যাচারী রাজকর্মচারীদেরকেও সহ্য করতেন না। একবার তাঁর পুত্র মুহাম্মদ আযমকেও তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে। কারণ, মুহাম্মদ আযম আফজল নামে এক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য অত্যাচারী হাসান বেগকে বরখাস্ত করেন নি। অথচ জনসাধারণ হাসান বেগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাটের কাছে নালিশ করলো। তখনই সম্রাট আওরঙ্গজেব পুত্রকে লিখে পাঠালেন, 'সৌভাগ্যশালী পুত্র মুহাম্মদ এ সমস্ত ক্ষতিকর কার্যকলাপ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হও এবং সেখানকার অধিবাসীদের অবস্থা তদন্ত করে দেখ। নতুবা তোমার হাত থেকে জায়গীর ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে তুমি কিছুই পাবে না।'

বখ্‌শি নামে আর একজন কর্মচারী ছিলো। সেও জনসাধারণের উপর করতো ভীষণ অত্যাচার। এ কথাও আওরঙ্গজেবের কানে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ আযমকে লিখে পাঠালেন, 'তোমার সহচরকে অবশ্যই তোমার নিজের চাইতে উত্তম হতে হবে, যাতে তোমার জ্ঞান ও ঈমান বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। অনেকদিন থেকেই আমি শুনতে পাচ্ছি যে তোমার 'জায়গীর' জেলাগুলিতে প্রকাশ্যভাবে উৎপীড়ন চলছে।................

বখ্‌শিকে এতবেশি ক্ষমতাদান ও তার ওপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছ যে, তাঁর কার্যাবলীর বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারো নেই। এ মানে কি ?...............মজলুম মানুষের দীর্ঘশ্বাসকে ভয় কর। কারণ, তাদের ফরিয়াদ আল্লাহ্‌ শোনেন এবং কবূল করেন।'

এমনিভাবে রাজ্যের সবকিছুর উপর আওরঙ্গজেব কড়া নজর রাখতেন। এমনকি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনার জন্য জেলায় জেলায়

facebook/@maktabatuttalamij

সরকারী উকিল পর্যন্ত নিযুক্ত করেন। তারা সাধারণ লোকের সমস্ত দুর্দশার কথা সরাসরি নিজেদের কানে শুনতেন। আর জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিতেন যে, বাদশার বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ আছে কিনা। জনসাধারণ যদি সে ধরনের কোনো অভিযোগ করতো তবে উকিলরা তা সাথে সাথে মিটিয়ে দিতেন। কারণ, এ ছিলো বাদশাহ্র হুকুম। তাছাড়া, শত শত মাইল দূরে কোন পথিকের কোনো অসুবিধা হলেও তার সংবাদ বাদশাহ্র কাছে পৌঁছতো এবং বাদশাহ তার কঠিনভাবে জবাবদিহি করতেন।

আওরঙ্গজেবের শাসনকালেই অবৈধ ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে গেল। এ সবের নাম ছিলে যথাক্রমে ভুঙ্গি, পন্দারা, সারগুমারী, কারগুমারী, বারগাদী, তুগাসা, জর্মাসা, শুকরানা ইত্যাদি। এ সব অন্যায় ট্যাক্সের ভারে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। আর এসব সেই সম্রাট আকবরের আমল থেকে চলে আসছিলো। কিন্তু আওরঙ্গজেব এ প্রথা জনগণের স্বার্থে একেবারেই তুলে দেন। তাছাড়া আর একটি প্রথা চালু ছিলো। রাজ দরবারের কোনো বড় কর্মচারী মারা গেলে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজকোষে জমা নেয়া হত। কিন্তু আওরঙ্গজেব বুঝেছিলেন এটা নিশ্চয়ই সেই মৃত কর্মচারীর স্ত্রী–পুত্রদের উপর নির্মম কাজ। তাছাড়া, এ প্রথা অনেক অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই তিনি তা উঠিয়ে দিলেন।

এভাবেই আওরঙ্গজেব রাজ্যের সব অব্যবস্থা দূর করতে সমর্থ হলেন। আর সাথে সাথে রাজ্যে উন্নতি হতে শুরু করলো। এদিকে জনসাধারণ তাঁকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতে শুরু করলো। একে তো তিনি মধুর ব্যবহারের মানুষ, তাতে আবার জনদরদী। তার উপর আবার নিজেই সবকিছু তদারক করে বেড়াতেন। এটা তো একজন আল্লাহ্ওয়ালা শাসকের হতেই হবে। তিনি আল্লাহ্র ভয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরবেন সেটাই স্বাভাবিক। তাই জনসাধারণ তাঁকে ভালোবাসবে

facebook/@maktabatuttalamij

না তো কাকে ভালোবাসবে? আর রাজ্যের সমস্ত মানুষ তাঁকে ভালোবাসতো বলেই তাঁর সময়ে রাজ্যের উন্নতি হয়েছিলো সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া, তাঁর সময়ই রাজ্যের সাধারণ মানুষ মানুষ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছিলো সর্বাধিক। এর পিছনে তাঁর মহত চরিত্রও কম সাহায্য করেনি।

চরিত্র

কুরআনের আলোকে জানা যায়, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে দুনিয়ার সবাই তাদেরকে ভয় করে। আর যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না দুনিয়ার সবাই তাদেরকে ভয় দেখায়। আওরঙ্গজেব আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন। আল্লাহ্‌ভীতিই তাঁকে এক অর্থে দুর্দান্ত সাহসী করে তুলেছিলো। ছোট বেলায় হাতীর সাথে লড়াই থেকে শুরু করে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে জয় তাঁর দুর্দান্ত সাহসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সে বলখের যুদ্ধের সময়কার ঘটনাটিই বা কম কোথায়। এক সময় বলখের ময়দানে আবদুল আযীয খাঁর সাথে যুদ্ধ শুরু হলো। চারদিকে অগণিত তীরের বৃষ্টি হচ্ছে। অস্ত্রের ঝনঝনানির কথা না হয় দূরেই থাকলো। ঠিক সে সময়ই যোহরের নামাযের সময় হলো। কিন্তু আওরঙ্গজেব নির্ভীকভাবে ঘোড়া থেকে নেমে নামায আদায় করলেন। মনে হলো—নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়ালে ওসব যুদ্ধ কিছুই নয়। কারণ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যদি সাথে থাকেন তবে কিসেব ভয়। এখানেই তো সত্যি-কারের ঈমানদারের পরিচয়। আর এইনা দেখে আবদুল আযীয খাঁর মাথা গেল ঘুরে। তিনি ভাবলেন, এমন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সাথে যুদ্ধ করা ঠিক নয়। তাছাড়া, এ লোকের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ হলো অদৃষ্টের সাথে যুদ্ধ করা। অতএব, আযীয খাঁ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সরে পড়লেন।

আওরঙ্গজেব কুরআন এবং হাদীস বিরোধী কোনো মতবাদ, আচার-আচরণের সাথে কখনো আপস করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন

facebook/@maktabatuttalamij

কুরআন ও হাদীসকে অনুসরণ করতেন, তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও যথাসম্ভব ইসলামের আইনগুলো কার্যকরী করার চেষ্টা করতেন। তিনি জানতেন, ইসলামের আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করলে রাষ্ট্রের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আল্লাহ্‌র আইনে কোনো ভুল নাই। আল্লাহ্ সব ভুলের উর্ধ্বে। তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে সমান জ্ঞান রাখেন। সে তুলনায় মানুষের তৈরি আইন-কানুনে নানা ধরনের ভুল থাকে। কারণ, মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এজন্যই আওরঙ্গজেব আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত নিজের চরিত্রও গড়েছিলেন। তাঁর জীবনে নামায, রোযা কাযা করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বরং তিনি তাহাজ্জুদের নামাযসহ নিয়মিত সব নামাযই পড়তেন। এমনকি রমযান মাসের শেষ দশদিন মসজিদে অবস্থান করে দিনরাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাছাড়া, রাজনৈতিক কারণে হজ্জে যেতে না পারলেও হজ্জে যেতে ইচ্ছুক লোকদের অকাতরে দান করতেন। আর মক্কা শরীফে যাবার পথ বিপদমুক্ত করার সব ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি ইউরোপীয় বণিকদের কয়েকবার শায়েস্তাও করেন। এসব কারণেই ইসলামের শত্রুরা তাঁকে জঘন্যভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছে।

আওরঙ্গজেব আলমগীর অত্যন্ত সৎ এবং মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। অন্যায় কথা ও কাজ তাঁর জীবনে কখনো দেখা যায়নি। বিনয় ছিলো তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। তিনি গুণী ব্যক্তিদের অত্যন্ত সমাদর করতেন। আর দুঃখীদের পাশে তো সব সময়ই থাকতেন। এজন্যই তিনি রাজ্যের ধনভাণ্ডারকে সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতেন। তাই সেখান থেকে নিজের জন্য কিছুই পেতেন না।

অনেকে আওরঙ্গজেবকে ফকির বাদশাহ বলে মনে করে। আসলেও তিনি ফকিরের মত জীবন যাপন করতেন। কারণ, জনসাধারণের জন্য তিনি জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি রাজকোষ থেকে কিছু

facebook/@maktabatuttalamij

তো নিতেনই না, অধিকন্তু নিজের হাতে টুপি সেলাই করে বাজারে বিক্রি করতেন। তার থেকে যে পয়সা আসতো তা দিয়েই তিনি কোনো রকমে সংসার চালাতেন। আর সব সময়ই বলতেন, 'রাজা-বাদশাহ্দের আরাম-আয়েশ করা উচিত নয়। তারা তো জনগণের সেবার জন্যই আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছেন। আল্লাহ্ তাদেরকে মজলুম মানুষের সেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ কথাগুলো তিনি মৃত্যুর সময়ও ভুলে যান নি। তাই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তেও সেই উইল লিখে গেলেন—

'টুপি সেলাই করে আমার উপার্জিত চার টাকা দু'আনা রয়েছে আয়া বেগার কাছে। সে টাকা নিয়ে আমার কাফনের জন্য ব্যয় করবে। কুরআন নকল করে যে তিন শ' পাঁচ টাকা আমি পেয়েছি, আমার মৃত্যুর দিনে সে টাকা গরীবদের ভেতর বিলেয়ে দেবে।'

এটাই তো একজন সত্যিকার মুসলমান শাসকের পরিচয়। কারণ, যে আল্লাহ্কে ভয় করে সে কখনো মানুষের অমঙ্গল করতে পারে না। আল্লাহ্র আইন-কানুন সে এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাবে না। একথা সম্রাট আওরঙ্গজেবের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর তাঁর মত একজন ধর্মপ্রাণ শাসকের উদাহরণও খুব একটা মেলে না।

ইফাবা—২০০৪-২০০৫—প্র/৬৫৪২(উ)—৫,২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
শিশু-কিশোরদের জন্য কয়েকটি বই

বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক	পৃষ্ঠা	মূল্য
হযরত বিলাল (রা)	সাইয়েদ আতেক	৩৫	১৯.০০
দুই সাহাবীর কাহিনী	ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	৪৫	৩২.০০
পরীর পাহাড়	মনওয়ার হোসেন	৪০	২০.০০
আলোর সেতারা	মসউদ-উশ-শহীদ	৩২	১৫.০০
লাল সবুজের গল্প	মুহাম্মদ বদরুল আলম	১২৪	৪৭.০০
ছোটদের বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৬৩৯	২৮০.০০
ছোটদের বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	৫৪০	২৭২.০০
হাদীস পড়ি জীবন গড়ি	সৈয়দ নাজমুল আবদাল	৫৬	৪০.০০
সেই দীপ্ত শপথ	মুকুল চৌধুরী	৩২	২৪.০০
আমি সম্রাট নই	হোসনে আরা শাহেদ	৩২	৫০.০০
খোদার রাজ্য	অধ্যাপক আবদুল গফুর	৬৮	১০.০০
শেখ সাদীর গল্প	আবদুস সাত্তার	৩৮	২৭.০০
ছোটদের জ্ঞানকোষ (১ম খণ্ড)	মাসুদ আলী	১১০	২৫.০০
হাদীসের কাহিনী	মোবারক হোসেন খান	৩০	২০.০০
গল্পে হযরত মুহাম্মদ (সা)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	৭২	৩৬.০০
সোনালী যুগের কথা	নূরুদ্দীন আহমদ	৪৮	২৯.০০
ছোটদের নবী কাহিনী	ড. সৈয়দ আলী আশরাফ	৭২	১৬.০০
হযরত ইউসুফ (আ)	আবুল কাশেম আশেকী	২৮	১৭.০০
ছোটদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)	ড. কাজী দীন মুহম্মদ	৭৮	৩৮.০০
মুসলিম মনীষীদের ছেলেবেলা	হারুনুর রশীদ	৮৮	৩২.০০
ছোটদের হাসানুল বান্না	কাজী গোলাম আহমদ	২৮	৯.০০
মহাকবি আলাওল	নুরুল ইসলাম মানিক	৮৬	৪৫.০০
নবী মোর পরশমণি	জামান মনির	৬৪	৩৭.০০
ছোটদের ইসলাম	এ জেড এম শামসুল আলম	৪৪	২৫.০০
পেয়ারে রাসূল	নূরুদ্দীন আহমদ	৩৮	২৫.০০
ন্যায় বিচারের গল্প	এডনায়েত রসূল	৩৫	১৯.০০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij